অদ্বৈত মল্লবর্মণ : তাঁর লুপ্ত রচনার খোঁজে

অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' লিখে বাংলা সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছেন। কিন্তু ১৯৫১ সনে মৃত্যুরও প্রায় এক যুগ পর পর্যন্ত তিনি বিস্মৃতির অন্তরালেই ছিলেন। ১৯৫৬ সনে গ্রন্থাকারে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছেপে বের করার পর এটি সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ উপন্যাস উৎপল দত্তের পরিচালনায় বিজন ভট্টাচার্য ও সৌভা সেনের সাড়া জাগানো অভিনয়ে নাটক হিসাবে কলকাতার মিনার্ভা মঞ্চে ১৯৬৩ সনের ১০ মার্চ থেকে শততম রজনী প্রদর্শিত হয়। এতেই তাঁর খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনাধীন চলচ্চিত্র 'তিতাস একটি নদীর নাম' ১৯৭৩ সনে মুক্তিলাভের পরে।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৯০-এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর লেখক খ্যাতি আবদ্ধ থাকে উচ্চস্তরের বিদগ্ধ পাঠক-শ্রোতা ও পণ্ডিত সমাজের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের দুই খ্যাতিমান গবেষক, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'-এ অনেকখানি জায়গা দিয়ে উচ্চমূল্যে উক্ত গ্রন্থটির আলোচনা লেখেন। এ সকল গ্রন্থে তিতাস-এর রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর মৌলিকত্ব স্বীকৃতি লাভ করায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পঠিত বিশ্লেষিত হবার সম্মান পেয়ে যান। বহির্বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যসমাজেও অদ্বৈত চর্চা নব্বইয়ের দশকেই সুবিস্তৃত হয়।

AMARBOI.COM

অদ্বৈত মল্লবর্মণের স্ব-সম্প্রদায়ের সামর্থ্যবান শিক্ষিত সুধীজনেরা, যথা রণবীর সিংহ বর্মণ প্রমুখ ১৯৬৯ সনে অদ্বৈতকে স্মরণ-বরণ করার লক্ষ্যে গঠন করেন 'পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতি'। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি স্মরণ-সভা তথা 'তিতাস-সন্ধ্যা'র আয়োজন করে তাঁরা বৃহত্তর বিদ্বৎ ও সুধী সমাজের কাছ থেকে অদ্বৈতের সম্মান ও স্বীকৃতি আদায়ের সফল আন্দোলন করেন। ১৯৯৫ সনে তাঁরা গঠন করেন 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি'। 'ভাসমান' নামের দুটি বার্ষিকী প্রকাশ ছাড়াও তাঁদের অন্যতম সদস্য সুশান্ত হালদার অদ্বৈতের 'রাঙামাটি' উপন্যাসটি সম্পাদনা করে ১৯৯৭ সনে পুঁথিঘর থেকে প্রকাশ করেন। আরেক সদস্য দেবীপ্রসাদ ঘোষ 'সাপ্তাহিক নবশক্তি' ও 'সাপ্তাহিক দেশ' ও 'আনন্দবাজার'-এর পাতা থেকে ২২টি নাতিদীর্ঘ রচনা 'বারোমাসী গান ও অন্যান্য' শিরোনামে ১৯৯০ সনে প্রকাশ করেন। অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস ও অন্যরা মিলে 'চতুর্থ দুনিয়া' পত্রিকার 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা : ১৯৯৪' প্রকাশ করেন 'বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা'র ব্যানারে। এসবে অদ্বৈতসংক্রান্ত অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়ে সম্প্রচার লাভ করেছে। অচিন্ত্য বিশ্বাস অদ্বৈতের 'শাদা হাওয়া' (১৯৯৬), 'রাঙামাটি' (১৯৯৭) ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৯৮) সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করেন। এই সময়ের (১৯৯২) সেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ কল্পনা বর্ধনের অনুবাদে 'পেঙ্গুইন বুকস' থেকে 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর ইংরেজি ভার্সনের প্রকাশ।

উপর্যুক্ত সূত্রসমূহে ক্রমাগত অদ্বৈত সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও বিশ্লেষিত এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতা থেকে তাঁর কতিপয় রচনা সঙ্কলিত হয়। এই উদ্যোগ বাংলাদেশেও দেখা যায়। আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত লোকায়ত পত্রিকার ১৯৯৮ সনের দুটি সংখ্যায় 'ভারতের চিঠি–পার্ল বাক্‌কে' ও 'বন্দী-বিহঙ্গ' শীর্ষক রচনা ছাপা হয়। আরিফ হাসান সম্পাদিত সাহিত্যলোক-এ 'শুশুক' ও অন্যত্র 'বিদেশী নায়িকা' শীর্ষক দুটি কবিতা উদ্ধৃত ও সঙ্কলিত হয়। এগুলো আমি সংগ্রহ করি এবং আমি মোহাম্মদীর পৃষ্ঠা থেকে তেরো শতকের একটি আরবীয় কবিতার অনুবাদ 'যোদ্ধার গান' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর সাত কিস্তির ফটোকপি কলকাতার অদ্বৈত গবেষকদের কাছে পাঠাই। এসবে ফল হয়। মোটামুটিভাবে একটি রচনা সমগ্রের রূপ লাভ করে অদ্বৈতর লেখাসমূহ।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মোহাম্মদীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনার সন্ধান তাঁদের কাছে পাঠালেও বিষয়বস্তুর কারণেই তা সম্ভবত রচনাসমগ্রে বর্জিত হয়েছে এবং কিছু রচনার সন্ধান এখনও কেউ নিচ্ছেন না। যেমন : মোহাম্মদীর 'সিরাজ স্মৃতি সংখ্যা'য় (আষাঢ় ১৩৪৭) 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' বিভাগে 'সিরাজের কাল' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন অদ্বৈত, যার মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল হিন্দু পণ্ডিত ও গবেষকগণ কর্তৃক নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের অনুকরণে কালিমা প্রক্ষেপণের অপপ্রয়াস সম্পর্কে কটাক্ষ করা। অদ্বৈত সংক্রান্ত পুস্তকাদিতে 'মোহন লালের খেদ', 'সিরাজ', 'পলাশী' প্রভৃতি কবিতা ও গানের উল্লেখ থাকলেও আগেই বলেছি, সম্ভবত বিষয়বস্তু ও রচনার চেতনাগত তাৎপর্যের কারণেই রচনাসমগ্রে বর্জিত হয়েছে। যদিও বিগত ৫০ বছর যাবত কলকাতার আলোচকগণ বলে আসছেন যে, অদ্বৈত স্বনামে ও বেনামে নবশক্তি, আজাদ, নবযুগ, কৃষক, মোহাম্মদী, যুগান্তর, দেশ ইত্যাদি পত্রিকায় অনেক লিখেছিলেন পেটের দায়ে কিংবা চাকরির প্রয়োজনে। কিন্তু সেসব সংগ্রহ ও সংকলনের প্রতি তাদের তেমন আগ্রহ প্রমাণিত হয় না। হয়ত এমনও হতে পারে, ঐ সকল রচনা অদ্বৈতের এমন এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত লেখক সত্তার উন্মোচন করে, যা অদ্বৈত গবেষকদের আগ্রহকে স্তিমিত করে দেয়!

কিন্তু এতসব কূটতর্কে সাধারণ পাঠকশ্রেণির কৌতূহল কম থাকারই কথা। যেটুকু পরিচয় অদ্বৈত পাঠকেরা পেয়েছেন, তাতেই তাঁরা গণমানুষের কবি ও সাহিত্যিক এই মানুষটিকে আপনজন ভেবে বরণ করে নিয়েছেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে অদ্বৈত মল্লবর্মণের চিন্তা, কর্ম ও সাহিত্যচর্চা ও তাঁর সুনাম বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। এই একই কারণে পশ্চিমবঙ্গে 'দলিত সাহিত্য আন্দোলন'ও দানা বেঁধেছে। নীচু শ্রেণির মানুষের ভিতর থেকে উঠে এসে সেই শ্রেণির মানুষজনের জীবনাচরণ, সংস্কৃতি ও বেঁচে থাকার সংগ্রামকে সাহিত্য শিল্পে অঙ্কনের ঘটনা অদ্বৈতের বেলায় যেভাবে স্ফূর্তি ও সাফল্য লাভ করেছে তেমন আগে খুবই কম ঘটেছে বলে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মরণীয় করে রাখবার জন্য ১৯৯৮ সন থেকে প্রবর্তন করেছেন 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মারক পুরস্কার'।

বাংলাদেশেও প্রগতিবাদী লেখক, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অদ্বৈতের সাহিত্যদৃষ্টির প্রসার ঘটিয়েছেন নানাভাবে বক্তব্য উপস্থাপিত করে। তাঁর ও অন্যদের প্রচেষ্টার ফলে 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলাদেশের স্কুল ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়ও হয়েছে। সব মিলিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেছেন। ১৯১৪ থেকে ১৯৫১ সন পর্যন্ত যে মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনকাল তিনি বিধাতার বিধানে যাপন করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারও বেশি কাল তিনি তলিয়ে ছিলেন অনাদর-অবহেলার বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে। তবে কেউ না জানলেও অদ্বৈত জানতেন, ধ্রুব বিশ্বাস আমাদের, তিনি শীর্ষ সবার এক সারিতে অধিষ্ঠিত হবেন। তাঁর সকল রচনার পাঠ শেষে এই প্রতীতি জন্মেছে বর্তমান পাঠকের অন্তরে।

যে কোন খ্যাতিমানের জীবনকথার মতোই অদ্বৈতের খ্যাতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপরও লেখালেখির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে হঠাৎ বৃদ্ধির অসতর্ক মুহূর্তে অদ্বৈত সম্পর্কে আমাদের সাহিত্যসমাজে নানা 'মিথ্যা' ও 'মিথ্' গড়ে উঠেছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এই মিথ্যা ও মিথ্ প্রচারের সূচনা করেছিলেন অদ্বৈত বন্ধু সুবোধ চৌধুরীই। তিনি 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর পাণ্ডুলিপি বন্ধু অদ্বৈতর কাছ থেকে ছাপাবার অনুরোধসহ সংরক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ১৯৫৬ সনে প্রকাশিত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর মুখবন্ধে অসত্যবচন মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি লিখেছিলেন :

> "আজ এই গ্রন্থ প্রকাশের দিনে আমরা আমাদের প্রিয়বন্ধু অদ্বৈত মল্লবর্মণকে বেদনার্তচিত্তে স্মরণ করি। কাঁচড়াপাড়া যক্ষা হাসপাতালে যাইবার পূর্বে তিনি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জীবৎকালে ইহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি নাই। লেখকের মৃত্যুর পরও কয়েকটি বৎসরই কাটিয়া গেল।... 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রথমত মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইতেছিল। গ্রন্থটির কয়েকটি স্তবক মুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন সময়ই এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি রাস্তায় হারাইয়া যায়। বলাবাহুল্য, অদ্বৈতের জীবনে এই ঘটনাটি সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক। বন্ধুবান্ধব এবং পাঠকদের আগ্রহাতিশয্যে লেখক আবার ভগ্নহৃদয়ে তিতাসের কাহিনী লইয়া বসিলেন...." ইত্যাদি।

কী কারণে জানি না, ঢাকার বাংলা একাডেমি 'চরিতাভিধান'-এ ও একই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে। এতে পাঠকের ভ্রম হয় যে, মোহাম্মদীতে চাকরিকালীন সময়ে কোন কারণে কর্তৃপক্ষের রূঢ় আচরণে বিক্ষুব্ধ-মন ও বিপর্যস্ত-চিত্ত অদ্বৈত পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে বসেন। আবার শান্তনু কায়সার বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ "অদ্বৈত মল্লবর্মণ'-এ লিখেছেন আর এক গুরুতর কাহিনী :

> "অদ্বৈত ... তিন বছর .... মাসিক মোহাম্মদীতে ছিলেন। ... এখানে কর্মরত থাকার সময়ই তিতাসের তৎকালীন লেখাটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা শেষ হওয়ার আগেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ মাসিক মোহাম্মদীর চাকরি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। মোহাম্মদী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হয়ত কোন কারণে তাঁর মতবিরোধ হয়ে থাকবে। কবি মতিউল ইসলাম বলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদীতে একবার অদ্বৈত তাঁর চারটি কবিতা 'রক্তনিশান' শিরোনামে ছাপেন। ঐ কবিতা চতুষ্টয়ে ব্রিটিশ-সরকার-বিরোধী বক্তব্য থাকায় পত্রিকার ওপর যে 'ঝঞ্ঝাট' নেমে আসে তার দায়িত্ব নিশ্চিতই অদ্বৈত মল্লবর্মণের ওপর বর্তায়।" (পৃ. ৫)।

উপর্যুক্ত বক্তব্যে সকলেরই মনে হবে, মোহাম্মদী কর্তৃপক্ষ অবিচার করেছিলেন অদ্বৈতের ওপর। সকল অদ্বৈতানুরাগীই সে-জন্যে মোহাম্মদীওয়ালাদের ওপর ক্ষুব্ধ। তার প্রমাণ, দেশে-বিদেশে অদ্বৈতের ওপর রচিত সকল রচনাতেই খুব গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয় এই 'চাকরিচ্যুতি', 'পাণ্ডুলিপি হারানো' এবং মোহাম্মদীতে হঠাৎ করে অসম্পূর্ণ রেখেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাপানো 'স্থগিত' করে দেয়ার মর্মন্তুদ ঘটনাসমূহ।

কিন্তু অদ্বৈতের কর্মজীবনের সকল তথ্য পূর্বাপর বিশ্লেষণ করলে শান্তনু কায়সার প্রমুখ অদ্বৈত গবেষকবৃন্দের বক্তব্য অসত্য, অযৌক্তিক, পারম্পর্যহীন প্রমাণিত হয়। আরও মনে হয় অদ্বৈতের ওপর যাঁরাই গবেষণা করেছেন– তাঁরা অদ্বৈত যে সকল পত্রিকায় কাজ করতেন– সে সকল পত্রিকার আয়ুষ্কাল যেমন জানেন না, তেমনি তা কোথায় পাওয়া যায় সে সন্ধান রাখেন না। রাখলেও সেসবের পৃষ্ঠা ওল্টাবার ধৈর্য ধারণ করেন না। অন্তত এ কথা জোর দিয়েই বলা চলে যে, দুই দেশের সেরা দুই অদ্বৈত গবেষক অচিন্ত্য বিশ্বাস ও শান্তনু কায়সার অদ্বৈতের 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাপা হয় যে মোহাম্মদীতে এবং অদ্বৈতর নামের সঙ্গে হরিহর-আত্মারূপে মিশে গেছে যে নবশক্তির স্মৃতি,– সেই 'মোহাম্মদী' ও 'নবশক্তি'ই যখন দেখেননি– তখন অন্য পত্রপত্রিকার প্রচ্ছদ উল্টে দেখার সুযোগও তাঁদের হয়নি (ব্যতিক্রম দেবীপ্রসাদ ঘোষ, তিনি নবশক্তির ১৮টি রচনা উদ্ধার করেন। তবে আরও যত্ন নিলে তিনি রত্ন উদ্ধার করতে সক্ষম হতেন নবশক্তির পৃষ্ঠা থেকে)।

বহুবার লেখা হয়েছে যে, তিনি সাপ্তাহিক নবশক্তি (১৯৩৪-৪১), মাসিক মোহাম্মদী (১৯২৭-৪৭, ৪৯-৭০), দৈনিক আজাদ (১৯৩৬-৮৬), দৈনিক নবযুগ (দ্বিতীয় পর্যায়, (১৯৪১-৪৭), সাপ্তাহিক ও দৈনিক কৃষক (১৯৩৮-৪৭), যুগান্তর (১৯০৫–) সাপ্তাহিক দেশ (১৯৩৩–) ও দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করতেন। এবং তাতে লিখেছেন চাকরির প্রয়োজনে, অর্থ পাবার প্রত্যাশায়। নিজ রচনা প্রকাশের সৃষ্টিশীলতার আনন্দলাভের আশায়ও তিনি লিখেছেন গল্প, কবিতা ও উপন্যাস– 'ভারতবর্ষ', 'মৃত্তিকা', 'ত্রিপুরালক্ষ্মী', 'সোনারতরী', ও ঐ কালের অন্যান্য সাময়িকীতে। এই সকল পত্রপত্রিকার প্রকাশকাল, স্থায়িত্ব প্রভৃতির সঙ্গে অদ্বৈতের লেখা প্রকাশের সূত্র মেলালে দেখা যাবে– তাঁর জীবনপ্রবাহের ছক যেভাবে আঁকা হয়েছে, তা কিছুটা ভেঙে যাবে এবং নতুন করে গড়তে হতে পারে তাঁর জীবনীপঞ্জি। কারণ আনন্দবাজার গ্রুপে কর্মকালীন সময়ে যে মোহাম্মদীতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাপা হয়েছে এই তথ্য সর্বত্র চেপে গেছেন জীবনীকারগণ।

জীবনীকারেরা মোহাম্মদী খুলে দেখলে এর প্রমাণ পাবেন। শান্তনু কায়সার লিখেছেন, মোহাম্মদীতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ধারাবাহিকভাবে তিন কিস্তি প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায় (দ্রঃ পৃ. ২২)। প্রকৃতপক্ষে সাত কিস্তি সাত সংখ্যায় প্রকাশ পায়। যে 'কবিতা চতুষ্টয়' ছেপে অদ্বৈত মোহাম্মদীর চাকরি হারান বলে শান্তনু কায়সার জ্বলজ্যান্ত বক্তব্য দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন– সে প্রেক্ষিতে মোহাম্মদী থেকে চাকরিচ্যুতির সময়কাল ১৯৪৫-৪৬ সনের মোহাম্মদীতে 'রক্তনিশান' নামের কোন কবিতাই ছাপা হয়নি। হলেও তাতে চাকরি যাবে না, কারণ মতিউল ইসলাম ব্রিটিশ সরকারের চাকরি করতেন, তিনি বিপ্লবী কবিতা লিখতে পারেন না, অন্তত স্বনামে। যদি লেখেনও তাহলেও ১৯৪৫ সালে তা ছাপার জন্য ব্রিটিশ সরকার বিরক্ত হয়ে মোহাম্মদীকে ধমক দেবে তা হয় না। আর মোহাম্মদীও অদ্বৈতের চাকরি সেজন্য খাবে না, কারণ, তখন ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন করে দিয়ে চলে যাবার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। অতএব অদ্বৈতের চাকরিচ্যুতির জন্য যে সকল কাল্পনিক কারণ বর্ণনা করা হয়েছে– তা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না।

শান্তনু কায়সারের বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত বইটি অবিকৃত অবস্থায় কলকাতা থেকে বের হয়। দুইটি বইয়ের দ্বারা তিনি দুই দেশে যত মিথ্যা ও মিথ্ ছড়িয়েছেন– তত আর কেউ করেননি। যেমন 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় অদ্বৈতর কোন গল্পই এখনও পাওয়া যায়নি এবং শান্তনু কায়সার এ যাবত অদ্বৈতর একটি গল্প, কবিতারও সন্ধান দেননি। কিন্তু শোনা কথার ওপর বেমালুম লিখে ফেলেছেন : "দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি প্রচুর গল্প, প্রবন্ধ ও অনুবাদ প্রকাশ করেন।" (দ্রঃ পৃ. ২৩) সঙ্গত কারণেই অধ্যাপক তিতাশ চৌধুরী অতিশয় দুঃখে দৈনিক সংবাদ (১৯৯৬)-এ লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন : "অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনীকার শান্তনু কায়সার তাঁর গ্রন্থে কোন কবিতা সংযোজনে ব্যর্থ হয়েছেন।" অথচ তিনি অদ্বৈত গবেষণার জন্য পুরস্কারও পেয়েছেন। অনুরূপভাবে অদ্বৈতের 'রচনাসমগ্র' বলে যা কিছু উপস্থাপন করা হয়েছে, তাও সম্পূর্ণ নয়।

প্রশ্ন জাগে তাই মনে, এমন একজন মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিকের সমগ্র রচনা উদ্ধার ও প্রচারে সাহিত্যসমাজের অনীহা কেন? যে তিতাসের জন্যই অদ্বৈত বিখ্যাত, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন, সেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও সুবোধ চৌধুরী ১৯৫৬ সনে প্রকাশের সময় ইচ্ছামত বাদ-ছাদ দিয়ে ছেপেছেন!! এই ঘটনা বাংলা ভাষার এক মহান লেখকের প্রতি চরম অবহেলা-অপমানের শামিল। তাই এখন কর্তব্য অবিকৃত 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রকাশিত করা। মোহাম্মদীর পাঠটি লেখক এমনভাবে পরিবর্তন করেছেন যে, দুটো আলাদা লেখা হয়ে রয়েছে। অন্তত বিখ্যাত একটি উপন্যাসের পরিশিষ্টে 'ভিন্ন পাঠ' সংযোজন করা সাহিত্য সমাজের রীতি। সে-রীতি অনুযায়ী মোহাম্মদীর সাত সংখ্যায় ছাপা হওয়া 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর খসড়া সঙ্কলনের গুরুত্বও খাটো করে দেখা চলে না।

রচনাসমগ্রে মুদ্রিত 'ভারতের চিঠি–পার্ল বাক্‌কে' বই আকারে তিনবার বের হয়। 'শাদা হাওয়া' ও 'রাঙামাটি' দুটো পত্রিকায় উপন্যাস আকারে ছাপা হয়–যা খুবই জানাশোনার মধ্যে ছিল। সেসব অপুরাতন পত্রিকাও সহজলভ্য। 'দেশ' একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা। তবে এর পৃষ্ঠা থেকে 'জীবন তৃষা' সঙ্কলনের মধ্যে কৃতিত্ব আছে। নবশক্তি, দেশ, আনন্দবাজার, মৃত্তিকা, মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকেও বিভিন্ন গবেষক যে সকল রচনা সাম্প্রতিককালের পত্রপত্রিকায় সঙ্কলিত বা পুনর্প্রকাশিত করেছেন তার মধ্যেও গৌরব আছে। কিন্তু নবশক্তি, মোহাম্মদী, সওগাত, কৃষক, নবযুগ, আজাদে প্রকাশিত অদ্বৈতের অন্য রচনাগুলো সংগ্রহ না করে এমনকি সন্ধান জানা লেখাগুলোও বর্জন করে কলকাতার দে'জ থেকে 'রচনা-সমগ্র' প্রকাশের তাৎপর্য কী, তা বুঝতে চেয়েও যেন বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বিশেষত, কলকাতার গ্রন্থাগারগুলোতে (তখনকার বাংলার সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতো) সহজলভ্য সাপ্তাহিক ও দৈনিক কৃষক, দৈনিক নবযুগ, দৈনিক আজাদ, মাসিক সওগাতসহ হিন্দু-মুসলমান পরিচালিত বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি আরও কি লিখেছিলেন–তাও কি অনুসন্ধান করা উচিত ছিল না? ঐ সকল পত্রিকার লেখাগুলো আবিষ্কার হলে অদ্বৈতকে নতুন করে বিচার করতে হবে। অন্তত নবশক্তিতে স্বনামে-বেনামে লেখা সম্পাদকীয় ও বিভাগীয় আলোচনাগুলো উদ্ধার করা গেলে 'সমাজসচেতন সাংবাদিক ও সম্পাদক অদ্বৈত'কে স্বরূপে চিনতে সহজ হতো।

নবশক্তির পৃষ্ঠায় 'সন্ধ্যা-বিরহিনী' শীর্ষক একটি কবিতা এখনও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। তাছাড়া মোহাম্মদীতে ছাপা 'সিরাজের কাল', 'মোহনলালের খেদ', 'সিরাজ', 'পলাশী' এগুলো এখনও পত্রিকার পাতাতেই আবদ্ধ আছে। নবশক্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা যায়, চতুর্থ বর্ষ থেকে তিনি স্বনামে সম্পাদক তো বটেই, অন্য কর্মচারীও নেই বলে সে সময় অদ্বৈত একাই বিভিন্ন লেখা লিখে পত্রিকা ভরাতেন। সেসব রচনা বেছে বের করা কষ্টসাধ্য হলেও সম্পাদকীয় আলোচনাসমূহকে অদ্বৈতের রচনা বলে (ভাষা ও রচনারীতির আলোকে) সহজেই চেনা যায়। এরকম প্রায় এক শ' সম্পাদকীয় শিরোনাম এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'সাপ্তাহিকী' নামে ১৯৩৯ সনের সংখ্যাগুলোতে অদ্বৈত আলোচনা লিখতেন– যা তাঁর রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ১৯৪১ নবশক্তির শেষ বছর। এ সময় পত্রিকার আর্থিক সঙ্গতি কমে যায়। লোকবলও। পত্রিকার পাতায় তখন 'ম্যাটার' ছিল কম। বড় পাতায় ছোট লেখা দিয়ে আধুনিক কবিতার বইয়ের মতো ঝরঝরে করে ছাপা হতো। এই কালের নবশক্তির সম্পাদকীয় আলোচনাগুলোও অন্য যে সব কারণে তাৎপর্যপূর্ণ তাহলো তখন 'পাকিস্তান' প্রস্তাব (১৯৪০) পাস হয়ে গেছে। ১৯৪১ সনের লোক গণনা (আদমশুমারী) হবে। অদ্বৈতরও চিন্তার পরিপক্কতা এসেছে। তাই দেখা যায় তাঁর একালের রচনা বয়স্ক রাজনৈতিক লেখকের ন্যায় সংক্ষিপ্ত কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ে উচ্চারিত। সংক্ষেপে সার বক্তব্য উপস্থাপনের আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদর্শন করেন অদ্বৈত এই সকল আলোচনায়। তাঁর 'সাহিত্য ও রাজনীতি', 'জিজ্ঞাসা', 'লোকগণনা', 'ভারতীয় সংস্কৃতি' ও 'মৈত্রী সম্মেলন', 'সিরাজের কাল' প্রভৃতি শিরোনামের লেখাগুলোতে তিনি পৃথিবীর বাতাস বুঝে আজকের পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের বক্তাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এ থেকে দূরদর্শিতার পরীক্ষা হয় অদ্বৈতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ছাড়া নবশক্তির প্রথম পর্বে (১-৩ বর্ষ) সহকারী সম্পাদক হিসাবে এবং সকলের কনিষ্ঠ কর্মচারীরূপে অদ্বৈতকে বেনামে অনেক যে লিখতে হতো সাগরময় ঘোষসহ অনেকেই তা জানিয়ে গেছেন। তাঁদের নির্দেশ অনুসরণ করে 'নবশক্তি'র নথি পরীক্ষা করে দেখা যায় অদ্বৈতের প্রথমদিকে লেখা কিছু গল্প ও আলোচনা এতে রয়েছে এবং খুব সম্ভব 'বিয়ে ও তারপর' শীর্ষক তাঁর আরও একটি নাতিদীর্ঘ উপন্যাসও মিলে যেতে পারে। সুধী গবেষকদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করছি। চতুর্থ বর্ষের প্রথম খণ্ডে জানুয়ারি ১৯৩৮ থেকে জুন পর্যন্ত যখন অদ্বৈত পুরো সম্পাদক তখন এটি ইন্দিরা বর্মণের নামে ধারাবাহিক ছাপা হয়। এই পত্রিকার 'মহিলা মহল'-এর পরিচালিকা-লেখিকা ছিলেন শ্রীমতী কল্যাণী বর্মণ। 'দুরবীণে দুনিয়া' বিভাগে 'বিশ্বদূত' লিখতেন আন্তর্জাতিক ঘটনার বিশ্লেষণাত্মক রচনা। পার্ল এস বাককে লিখিত ভারতের চিঠির লেখক অদ্বৈতের দ্বারা এটি লেখা খুবই স্বাভাবিক। 'পীঠ ও পট' লিখতেন 'ভাস্কর' নামে সিনেমার আলোচনা। সিনেমার সিরিয়াস দর্শক ও সমালোচক ('ছায়াছবির কাহিনী' শীর্ষক 'দেশ'-এ ছাপা প্রবন্ধের কথা স্মর্তব্য) অদ্বৈতের লেখা বলে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ এই বিভাগীয় রচনাগুলো এক এক সংখ্যায় এক এক নামে লেখা হতো। অদ্বৈত পত্রিকায় কখনও 'অদ্বৈত বর্মণ' কখনও 'শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ' নামে লিখতেন। এই 'বর্মণ' পদবীর লেখকেরাও কখনও 'ইন্দিরা বর্মণ' কখনও 'শ্রীমতী কল্যাণী বর্মণ'। 'বর্মণ' পদবীর লেখকদের মধ্যে অদ্বৈতের আগে বা সমকালে কি কেউ ছিলেন? শ্রী নির্মল বর্ধনের কবিতা ও গল্পও আছে নবশক্তিতে। এই লেখকের নামও অদ্বৈতের মতো কখনও 'শ্রী নির্মলচন্দ্র বর্মণ' কখনও 'নির্মল বর্ধন' লেখা হতো। এঁরা কারা? – প্রশ্ন জাগে। 'মহিলা মহল' অদ্বৈতের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত নবশক্তির নতুন বিভাগ, যা তাঁরই চিন্তাপ্রসূত। ঐ সময় থেকে 'সম্পাদকী' শিরোনামে লেখা হতো সম্পাদকীয়-আলোচনা। পরবর্তীকালে বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম দেয়া হয়েছে সম্পাদকীয়ের। নবশক্তির লেখক ছিলেন যাঁরা, অথবা, ঐকালের জীবিত লেখকদের কাছ থেকে ঐ সকল 'বর্মণ', 'বর্ধন' পদবীর লেখক আদৌ ঐকালে ছিলেন কিনা– যাচাই করে 'অদ্বৈতর রচনাসমগ্র' পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। আমার যতটুকু ধারণা জন্মেছে, তাতে সন্দেহ জেগেছে। নিশ্চিত হবার অবকাশ পেলে নিশ্চয়ই তাও করে দেয়া যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~